বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে

আহমদ ছফা

‘বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী বাঁচিবে না’

এই মন্তব্য করেছিলেন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তেমন একখানি ইতিহাস লেখা তারও পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। বাধা ছিল অনেক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক। এ চতুর্মুখী আক্রমণের মুখে বাঙালির ঠিকুজী কুলজী আবিষ্কার করে জনসমক্ষে তুলে ধরা অসম্ভব ছিল । আজকের দিনে বাঙালি সমাজের কোলঘেঁষা আত্ম-অপরিচিতির অন্ধকার অনেকটা কেটেছে, সংস্কারের জটাজালের নাগপাশ অনেক বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। বাঙালি জনগণের মন এমন অনেক ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক সত্য নির্বিবাদে মেনে নিতে রাজি হয়েছে, আগের দিনে এসব কথা শুনে বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরাও ভিরমি খেয়ে যেতেন। মন তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ইতিহাসটি এখন স্বপ্নই থেকে গেছে। তথ্যের সমাবেশ করা সম্ভব, ঘটনা বর্ণনা করা যায়, রাজা-রাজড়ার নামের তালিকা দেয়া যায়। সীমিত পরিসরে অর্থনীতি সমাজনীতি শিল্প সাহিত্যের উপর ভাসা-ভাসা আলোচনা- তাও করা যায় না এমন নয়। একটি গ্রন্থ-এর সবকিছুকে কোল দিয়ে ফুলে উঠতে পারে। কিন্তু ইতিহাস হয়ে উঠবে না।

বলা হয়ে থাকে, মানুষই মানুষের ইতিহাস। এবং মানুষই মানুষের ইতিহাসের নির্মাতা। ইতিহাসে এই মানুষের পরিচয় থাকা চাই। বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর মানুষেরই একটা ভগ্নাংশ। সুতরাং বিশ্বমানবতার অগ্রগতি এবং আত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী বাংলাদেশের মানুষও। বাঙালিকে শুধু বাংলাদেশের জারুল, গর্জন, শাল আদি বৃক্ষের মতো সৃষ্টিশীলতাবর্জিত জাতি হিসেবে বিচার করা ঐতিহাসিক সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক। আবার বিদেশী বিজাতির আরোপিত ধর্ম সংস্কৃতি বয়ে বেড়াবার ধোপার গাধা হিসেবে বাঙালিকে বিচার করাও ঐতিহাসিক সত্যের ঘোর অপলাপ। বাঙালির ইতিহাস চর্চা কখনো সহজ এবং স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হতে পারেনি। এখানে সেখানে এক আধটু প্রয়াস

দৃষ্টিগোচর হয় মাত্র। ইতিহাসকারদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তারা আপনাপন যুগচেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র। না হয় দু-একজন দু-এক পা এগিয়েছিলেন। এখানে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের একটি উক্তি স্মর্তব্য, 'বাঙ্গালী গড়ে ওঠেনি, ঢালাই হয়েছে'। বাঙালি সমাজের কোন অংশ ঢালাই হয়েছে সে বিষয়ে চৌধুরী মহাশয় অধিক কিছু না বললেও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ধরে নেয়া যায়, বিভিন্ন সময়ে রাজশক্তির আনুকূল্য করেছে যে সকল শ্রেণী তারাই ঢালাই হয়েছে, বাংলাদেশের আসল মানুষের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি। এই ঢালাই হওয়া মানুষরাই বাংলার আদিম কৃষিভিত্তিক বাঙালি সমাজের সংস্কৃতিতে লাবণ্যের সঞ্চার করেছেন। বাঙালি মনের পরিধি বিস্তৃত করেছেন। বাংলার ইতিহাসও লিখেছেন তারাই। তার ফলে দেখা যাবে ইতিহাসে ঢালাই হওয়া মানুষদের রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষের সমাজের চলিষ্ণুতা যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে বলতে হয় ইতিহাস শুধু অতীত ঘটনা কিংবা সাল তারিখ তাম্রলিপি বা শিলালিপির সমাহার নয়। যে মানুষ বর্তমানে বেঁচে আছে, ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবে, অতীত তাদের কেমন ছিল তার আসল প্রেক্ষিত তুলে ধরাই ইতিহাস। ভবিষ্যতের একটা বাস্তব পরিকল্পনা না থাকলে প্রকৃত অতীত রহস্যের উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। কেননা প্রকৃত অতীতের উপরই সত্যিকারের ভবিষ্যতের ভিত্তি।

আগের যুগের ইতিহাস লিখিয়েরা সাধারণ মানুষের শ্রম-চেষ্টা কল্পনা এবং ধ্যানকে কখনো ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে ধরে নেননি। তার ফলে ইতিহাস থেকে ইতিহাসের আসল উপাদান মানুষই বাদ পড়ে গেছে। তাদের এজন্য খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ একাট্টা হয়ে ইতিহাসের চেহারা পাল্টাবার জন্য নিজেদের বিক্রম এবং সংঘ শক্তির আস্থায় আস্থাবান হয়ে এগিয়ে আসেননি কখনো। ঐতিহাসিকও তো সমাজের একজন। সমাজ যদি না এগোয় ঐতিহাসিক তো আর হাওয়ায় ইতিহাসের উপকরণ খুঁজতে পারেন না। সাধারণ মানুষ যদি পৃথিবীতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া হয়ে না ওঠে, তাদের অতীতকে গৌরবময়ী করে ঐতিহাসিক দেখাতে পারেন না। তাই বাঙালির স্বপ্ন এখন পর্যন্ত স্বপ্নই থেকে গেছে।

বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান সংগ্রাম সে ইতিহাস লেখার সম্ভাবনাটিকে মূর্ত করে তুলেছে। কেননা এই মরণপণ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। তাদের স্বাধীনতার জন্য, সত্যের জন্য লড়তে হচ্ছে। লড়তে লড়তে, মরতে মরতে তাদের পথ পরিষ্কার করতে হচ্ছে। চরিত্রের যা কিছু মহৎ শ্রেষ্ঠ এবং সত্য তার উপর দাঁড়িয়েই তারা ফ্যাসীবাদী পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে। পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের মানুষকে দাস করে রাখবার জন্য মানুষের সমাজে জঙ্গলের আইন চালু করেছে। গত পঁচিশে মার্চ তারিখের পর থেকে সেই নৃশংস বনের আইন প্রয়োগ করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে খাঁচায় আটক রাখবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে তারা। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ পশুশক্তির দাস না থেকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে রণধ্বনি তুলেছেন। বস্তুত বাংলাদেশের এ সংগ্রাম প্রাগৈতিহাসিক পাকিস্তানি ডাইনোসরের বিরুদ্ধে সভ্য স্বাধীনতাকামী মানুষের মানুষী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের অ্যাসিড স্পর্শে বাঙালি মানসিকতার খুব দ্রুত পালাবদল ঘটছে। পূর্বেকার সংস্কারের জের রণ রক্ত সফলতার মধ্য দিয়ে তার চেতনা থেকে বুড়ো পাতার মতো ঝরছে প্রতিদিন। আর বিশ্বের এতাবৎকালের মানব সমাজের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার সারাৎসার তার চেতনায় স্থান করে নিচ্ছে এবং নতুন মানুষ হয়ে উঠছে প্রতিদিন। যে-কোনো জাতির জন্য আদর্শবদ্ধ দুঃখের হিমশীতল স্পর্শের চাইতে মহৎ শিক্ষা আর কিছু হতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ যারা লড়াই করছেন, যারা ছিন্নমূল হয়ে শরণার্থী শিবিরে বাস করছেন সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, হবেন। অনেকে প্রিয়জন বিসর্জন দিয়েছেন, দিচ্ছেন এবং দেবেন। বাঙালি জাতি সামগ্রিকভাবে এমন ত্যাগ এমন আত্মবিসর্জন ইতিহাসের আর কোনো পর্যায়ে করেনি। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই অন্ধ বিশ্বাসের মরচে প্রচণ্ড বাস্তব আঘাতের মুখে ঝরছে এবং চরিত্রের যা সত্যিকার শক্তি তা সৃষ্টিশীলতায় বিকাশ লাভ করছে। এই লড়াই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে বাংলার ইতিহাসের ভারকেন্দ্র ঢালাই হওয়া মানুষদের সমাজ থেকে বাংলার পাললিক মৃত্তিকার আসল সন্তানদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। বাংলাদেশে যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় আসন্ন হয়ে

উঠেছে তার স্থপতি বাংলার জনসাধারণ। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, নারী, পুরুষ, লেখক, শিল্পী এবং সর্বস্তরের মানুষ। সকলে অনুভব করে আসছিলেন উনিশশ বাহান্ন সাল থেকে তারাই ইতিহাসকে প্রবাহিত করে নিচ্ছেন। যতই দিন গেছে প্রতিবন্ধক প্রবল থেকে প্রবল হয়েছে এবং ইতিহাস সৃজনের প্রক্রিয়াতেও বেগ আবেগ দুই-ই এসেছে। উনসত্তর সালের আয়ুব খেদানো আন্দোলনের পর থেকে বাংলার সাধারণ মানুষের মনে এ প্রতীতি জন্মেছে যে ইতিহাস সৃজনে তার নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। সে বোধ এখন রণক্ষেত্রে পরীক্ষিত হচ্ছে। বাংলার জনগণই বাংলাদেশ স্বাধীন করছে এবং বাংলার জনগণই তার সমাজ বিন্যাসে রূপান্তর আনবে। এই সাধারণ মানুষরাই এখন বাংলার ইতিহাসের নায়ক। অনেক পেঁচালো বিতর্ক বাংলার ইতিহাসকে ঘিরে জমে উঠেছে এবং পণ্ডিতেরা এপক্ষ বা ওপক্ষে গিয়ে যুক্তির গোছালো সুতো আউলা করেছেন, এবার সে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হবে। বাংলার ইতিহাসে আর্য-অনার্য, হিন্দু-বৌদ্ধ, মুসলমান-হিন্দু এবং ইংরেজ ও দেশীয়দের মধ্যেকার অবদান কতটুকু নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখবার এবং বিচার করবার সুযোগ আসবে। উপমহাদেশের এই প্রত্যন্ত প্রদেশের অধিবাসীদের প্রকৃত বাঙালি পরিচয়টিও প্রোজ্জ্বলভাবে আভাসিত হবে। জগৎ-সভায় বাঙালি ভাবের ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে আসন পেয়েছে। এবার জাতি হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে। রাশিয়ান, আমেরিকান, চীনা এবং জাপানিদের মতো বাঙালিও ধ্যানসমৃদ্ধ, শক্তি প্রবুদ্ধ একটা জাতি। সে অপরের চাইতে ছোট নয় এবং অপরকে ছোট ভাবে না। এই বোধ বাঙালি সমাজে দাবানলের মতো দ্রুত সঞ্চারিত হতে লেগেছে এবং নতুন করে বেঁচে উঠছে বাঙালি। এই নবজাগৃতি তার প্রকৃত ভবিষ্যতের চিত্রলেখা রচনা করেছে। সুতরাং অতীতকে নিয়ে ভয় নেই। আর্য না হলে দোষ নেই। ইরান, তুরানী, আরবী পরিচয় দেয়া গৌরবের পরিচয় নয়। বাংলার মাটির সাক্ষাৎ সন্তান স্বীকার করে নিয়েও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ধর্মগত, সম্প্রদায়গত, দেশগত সংকীর্ণতার বেঢপ চশমা এঁটে অতীতের পানে তাকাবার প্রয়োজন বাংলাদেশে অবসিত। বাংলার ইতিহাসে যারাই যাই করুক, কল্যাণ দৃষ্টির স্পর্শে মাননীয় অংশটুকু আপনার নিজের বলে দাবি করতে পারবে বাঙালি। এই সেই দেশ যেখানে মানুষের মুখের এলোমেলো ধ্বনিপুঞ্জ

চর্যাপদের কবির সৃষ্টিশীল মাধুর্যে কবিতা হয়ে উঠেছে। ধ্যানের ধ্বনি মন্দিরে বিহারে রণিত হয়েছে, মনের অতলান্তে শান্ত আবেগ মসজিদের গম্বুজে রূপ পেয়েছে। বীর্যের ব্যঞ্জনা অসংখ্য হর্মমালার নির্মাণশৈলীতে ফুলের মতো বিকাশ লাভ করেছে, মৈত্রী ভাবনা রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির ঢলঢল লাবণিতে প্রকাশমান হয়েছে, তৃষিত জনের তৃষ্ণা দূর করার জন্য সজল দিঘি আকাশ পানে গহন কালো চোখ মেলেছে, প্রাচীন কবির প্রেম চিন্তা ঝিনুকের বুকে মুক্তোর দানার মতো শব্দে ধ্বনিত স্পন্দিত হয়েছে, দুলছে কালের কণ্ঠে ইন্দ্রমণির হার হয়ে। সুফি দরবেশের সাম্যচিন্তা গ্রামে গ্রামে লোকালয়ে লোকালয়ে বিভেদের প্রাচীরে আঘাত হেনেছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান মানুষের অন্তরে অন্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, আধুনিক যুগের সাহিত্য যার স্পর্শে একূল ওকূল দুকূলপ্লাবী প্রমত্তা পদ্মার আকার পেয়েছে। সবকিছু বাঙালির ঐতিহ্য, সবকিছুকেই বাঙালি অন্তর দিয়ে আলিঙ্গন করবে। পৃথিবীর ভাবপ্রবাহ, কর্মপ্রবাহ এবং বিজ্ঞান চেতনা বাংলাদেশের চিত্ততল সিক্ত করে তুলেছে, হাতকে নিখুঁত করছে এবং বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও বস্তুঘেঁষা করছে। বাঙালি সমাজ ও বিশ্বের মানব সমাজের এক অংশ এই পরিচয় এবং বাঙালির যে একটি স্বকীয়তা রয়েছে সে পরিচিতি ও তার পেছনের কাহিনী তুলে ধরার সময় এসেছে এবং তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে।